দৈনিক সংবাদ

FEB. 06 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪.....

পশ্চিমবঙ্গ ॥ নির্জন দ্বীপের মাদ্রাসাগুলো চলে সৌদি সহায়তায়

মূল ভূখণ্ড থেকে সাত কিলোমিটার দূরে পদ্মার বুকে ছোট্ট নির্জন দ্বীপে 'আল মাদ্রাসাতুস সালাফিয়া দার উল হাদিস'।

দ্বীপে সাকুল্যে দু'টি গ্রাম পিরোজপুর ও বাজিতপুর। হাজার ছয়েক জনবসতির গ্রাম দুটিতে মাত্র ১০ জন ২০ বিঘা জমির মালিক। বাকিরা প্রান্তিক চাষী, ক্ষেতমজুর। বর্ষার চার মাস প্রায় গোটা তল্লাটই পাঁচ থেকে আট ফুট জলের তলায় চলে যায়। ফলে ফসল বলতে মাত্র দু'টি—বর্ষার শেষে কড়াই আর বোরো। এহেন গ্রামেও প্রেফ দানের টাকাতেই আল মাদ্রাসাতুসের সমস্ত খরচ-খরচা মিটে যায় বলে মাদ্রাসা কমিটির সম্পাদক শেখ মহম্মদ নইমুদ্দিনের দাবি।

গ্রাম দু'টিতে কারও পাকা বাড়ি নেই, বিদ্যুৎ নেই, ডাকঘর নেই, রেশন দোকান নেই, স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকেও নেই। কিন্তু তিন বিঘা জমিতে ইংরেজির এল আকৃতির বড় একতলা মাদ্রাসা ভবন আছে। সেখানে শ'পাঁচেক অনাবাসিক ছাত্রের পাশাপাশি আবাসিক ছাত্রের সংখ্যা ৫০। মৌলভী ছ'জন। আবাসিক ছাত্র ও মৌলভীরা মাদ্রাসাতেই খান দু'বেলা। অর্থাৎ দু'বেলায় ১১২টি পাত পড়ে। নইমুদ্দিনের হিসাবে, এতে বার্ষিক খরচ দু'লাখ টাকা। কিন্তু সেই টাকাই বা কীভাবে আসে? তার কথায়, গ্রামের কোনও লোকের জমিতে ২০ মণ ফসল হলে তার এক মণ তিনি মাদ্রাসায় দান করেন। এতেই আমাদের চলে যায়।

কিন্তু গ্রামের চেহারা আর সম্পাদকের বক্তব্য মেলানো যায় না। হাজারখানেক পরিবারের মধ্যে অর্ধেকই তো দু'বেলা পেট পুরে খেতে পায় না। তাহলে? এর জবাবে মাদ্রাসার প্রধান মহম্মদ এমদাদুল হক বলে ফেলেন, অরাঙ্গাবাদের চন্দ্রপাড়ার একজন সৌদি আরবে থাকেন। তার মাধ্যমে কিছু টাকা পেয়েছিলাম আমরা। আর কিছু জানানোর আগেই তার মুখে কুলুপ।

প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার ব্যাপারে মুখে কুলুপ বেলডাঙার সুরুলিয়ার 'দার-উল-উলুম মাদ্রাসা'র কর্মকর্তাদেরও। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে আট বিঘা জমিতে তেতলা মাদ্রাসা ভবনে ২০ জন মৌলভীর মধ্যে ১৩ জনই আবাসিক। শরিফুল ইসলাম নামে এক মৌলভী জানান, ২শ' ৯০ জন ছাত্রের মধ্যে ১৭০ জন আবাসিক। বলাই বাহুল্য অবৈতনিক। এক ছাত্র জানালেন, সকাল-বিকালে প্রায় ২শ'টি করে পাত পড়ে। মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বাদ দিয়ে সপ্তাহে পাঁচদিন এরা মাংস-ভাত খান। বাকি দু'দিন মাছ বা ডিম। এছাড়া রয়েছে মৌলভীদের বেতন। কিন্তু মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের দাবি, বার্ষিক খরচ ১০ লাখ টাকার বেশি নয়। জাকাত, ফেতরা কিংবা ব্যক্তিগত দানে মাদ্রসার খরচ চলে যায়।

কিন্তু যে বেলডাঙা এলাকায় সরকারি হিসেবেই দারিদ্র্যসীমার নিচের ভূমিহীন মজুরের সংখ্যা ৪০ শতাংশ, প্রান্তিক চাষী আরও প্রায় ৪০ শতাংশ, সেখানে মানুষ কত জাকাত বা ফেতরা দেবেন? একটি মাত্র মাদ্রাসা নয়, বেলডাঙাতেই আছে ২০টি মাদ্রাসা আর ২শ'টি মসজিদ। এলাকার মানুষ কাকে দান করবেন আর কাকে করবেন না?

গোয়েন্দাদের বক্তব্য, এইসব অননুমোদিত মাদ্রাসার কর্তারা আয়ব্যয়ের যে হিসাব দেন, তা অনেক ক্ষেত্রেই ঠিক নয়। তারা অনেক কিছু গোপন করেন। গল্পের কুমির ছানার মতো জাকাত, ফেতরা বা ওসুলের গল্প শোনান। বিদেশ থেকে অবৈধ পথে নিয়মিত টাকা না এলে জেলার প্রায় সর্বত্র ভেঙেপড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশেই খারিজি মাদ্রাসার ঝাঁ-চকচকে দালানবাড়ি গজিয়ে ওঠা সম্ভবপর হত না। সেখানে বিনা পয়সায় এতজনের থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করা যেত না। জেলার এক প্রাক্তন পুলিশ সুপারের কথায়, বেশ কয়েকটি অবৈধ মাদ্রাসার হিসাবের সঙ্গে বাস্তবের বিরাট ফারাক যে-কারও চোখেই ধরা পড়বে। টাকা আসে হুন্ডিতে, টাকা-ট্রান্সফার বা টিটির মাধ্যমে, যদিও তা হাতেনাতে ধরা সহজ নয়। গোয়েন্দাদের খবর, সীমান্তবর্তী একাধিক মাদ্রাসার সঙ্গে জাল নোট চক্রেরও যোগাযোগ রয়েছে।

অবৈধ যোগাযোগের সূত্রে সন্ত্রাসবাদীরাও যে মাঝেমধ্যে খারিজি মাদ্রাসাকে 'নিরাপদ আশ্রয়' হিসাবে ব্যবহার করে, চার বছর আগেই তার প্রমাণ মিলেছিল লালগোলার 'আল-মাহাদুস সালাফি মাদ্রাসা'য়। দিল্লি ও কোয়ম্বত্তুরে পরপর আরডিএক্স বিস্ফোরণের তদন্তে গোয়েন্দারা জানতে পারেন, লালগোলা, ধুলিয়ান ও মালদহের বিভিন্ন মাদ্রাসায় ছাত্র সেজে আশ্রয় নেওয়া বাংলাদেশী যুবক সফিকুল বিস্ফোরণে ব্যবহৃত ৭৫ কেজি আরডিএক্স বাংলাদেশ থেকে লালগোলা হয়ে দিল্লিতে পৌঁছে দিয়েছিল। সফিকুল এখন তিহার জেলে বন্দি।

কোনও কোনও খারিজি মাদ্রাসায় যে উগ্রপন্থাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তা কার্যত স্বীকার করেছেন নিষিদ্ধ সংগঠন সিমির এক নেতা। সম্প্রতি তিনি বলেছেন, আমরাও অন্যদের মতো দেশপ্রেমিক। তবে কওম (সম্প্রদায়)এর উপরে রাষ্ট্র বা অন্য সম্প্রদায়ের অত্যাচার শুরু হলে আমরাও পাল্টা আঘাত হানার জন্য জোটবদ্ধ হওয়ার জন্য বিভিন্ন মাদ্রাসায় মিলিত হই।

❑ আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে